এবং শেষ পর্যন্ত জমি বিক্রি হয়ে যাওয়া। তবে আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, রাজস্ব আদায়ের এইসব বন্দোবস্তের ফলাফল নিয়ে একদা যেরকম ভাবা হত, অতটা বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। সেসব ফলাফল এক এক অঞ্চলে এক এক রকম হয়েছিল। অর্থাৎ সেসব বন্দোবস্তের ফলাফলের আঞ্চলিক পার্থক্যের চরিত্র এখন ধরা পড়েছে। জমি হাতবদলের ঘটনায় সব জায়গাতেই জমির স্বত্বাধিকারের কাঠামোয় মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কাজেই কৃষিপ্রধান সমাজের হতাশা ইত্যাদি কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা আগে যতটা ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে বেশিই ছিল। কিন্তু যেসব গোষ্ঠী এবং শ্রেণী টিকে ছিল, তাদের তারা ভোগ করত সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অধিকার, দায় এবং ক্ষমতা। এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেসব অভাব অভিযোগ জেগে উঠত, সেগুলি একর পর এক কৃষক অসন্তোষের মধ্যে ব্যক্ত প্রতিফলিত হত। এইসব নিয়েই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকটি বিশিষ্ট হয়ে আছে। এদিকটা আমরা পরের অধ্যায়ে খুঁটিয়ে দেখব।

২.৪ শাসনযন্ত্র

সাম্রাজ্য ক্রমশ আয়তনে বাড়তে থাকলে তার সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যকে আঁটসাট করে ধরে রাখার জন্য একটি দক্ষ এবং কর্তৃত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার আবশ্যিকতাও বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। কাজেই ইয়োরোপীয় আদর্শকে এদেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার কোন চেষ্টা হয় নি। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এশিয়া মহাদেশের মানুষ যে "যুক্তিশাসিত" এই ধারণাটি দুর্বল হয়ে আসতে থাকে। কারণ, বিজয়ী গোষ্ঠীরা বুঝতে পারে যে, রাজস্বপ্রাপ্তিকে সুনিশ্চিত করার স্বার্থে সজোরে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কায়েম করা প্রয়োজন। সংস্কারের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টিয় সুসমাচারের (ইভানজেলিক্যাল) আদর্শের প্রচার ও প্রসারের এবং ইউটেলিটেরিয়ানদের (হিতবাদীদের) আন্তরিক আগ্রহ ও উৎসাহের সামনে এদেশের সংস্কৃতির প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের ধারণাটি পিছু হটতে শুরু করে। বলা চলে উন্নতিসাধনের একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল এদেশের ব্রিটিশ প্রশাসনে অসামরিক প্রশাসন ও বিচারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের কর্তৃত্ব প্রয়োগকে ব্রিটিশ নিয়মনীতির সঙ্গে সমরূপ করে তোলা হয়। আশা করা হয়েছিল যে, যদি উপযুক্ত ও সঙ্গত আইন এবং সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রয়োগ করা যায়, তাহলে ব্যক্তিমানুষ স্বৈরাচার, অযৌক্তিক প্রথা-প্রকরণ ও পরম্পরার কবল থেকে মুক্ত হতে উদ্যোগী হবে। এতে শ্রম ও পুঁজি গঠনের ব্যাপারে পূর্ণ ও অবাধ সুযোগ আসবে। ব্যক্তিগত মালিকানা ও অধিকারের বিষয়টি যথাযথভাবে দৃঢ় হবে। হিতবাদীরা ভারতে "আইনের অনুশাসন" চালু করার কথা বলেছিলেন। সারা দেশে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে এক নিয়মানুসারী প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়, অবশ্যই ব্রিটিশ স্বার্থের উপযোগী করে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি এদেশে পরম্পরাগত ভারতীয় শাসকের মতই শাসন করত, বুঝি বা একটু বেশি মাত্রায় নতুন ভাব, নিয়মনীতি কিংবা হস্তক্ষেপের বিষয়কে এড়িয়ে। তবে কিন্তু কৃষককে চাপ দিয়ে কৃষিজ উদ্বৃত্ত আদায়ের বেলায় কোম্পানি ষোলো আনা সজাগ থাকত। এই দৃশ্য অবশ্য আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে যায়, উপরোক্ত মননশীল আন্দোলনের মতাদর্শগত চাপের কারণে। তাছাড়া ব্রিটেনে ইতিমধ্যে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে। তার স্বার্থে গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত বাজারগুলিকে এককাট্টা করে এবং কৃষিজ কাঁচামালের উৎস হিসেবে তার উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়ারও দরকার পড়েছিল। এইসব কারণে ভারতবর্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে স্পষ্ট ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব কায়েম করার দরকার হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজের ভিতরে বেশি করে ঢোকার প্রয়োজন হয়েছিল এবং ব্রিটেন সহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণে আনারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

বিচার ব্যবস্থা

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। কিন্তু তখনও সেখানে নবাবী প্রশাসন ও মুঘল ব্যবস্থা থেকেই গিয়েছিল। দ্বৈতশাসনব্যবস্থার বাস্তবিক তাৎপর্য কিছুই ছিল না,

যেহেতু কোম্পানি কোন রাখঢাক না করে সুপরিকল্পিত উপায়ে নবাবের কর্তৃত্বকে খাটো করে দিয়েছিল। তবে এই কাল্পনিক সার্বভৌমত্বকে সত্য বলে কিছুদিনের জন্য চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে সুবা-বাংলার বিচার ব্যবস্থার দায়িত্বভার প্রাথমিকভাবে ভারতীয় আধিকারিকদের হাতেই ছিল। এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় মামলার বিচারেই মুঘল ব্যবস্থাকে অনুসরণ করা হত। কোম্পানির দেওয়ানি এক্তিয়ারের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি করে ক্লাইভ মহম্মদ রেজা খানকে নিয়োগ করেন। নায়েব নাজিম হিসেবে রেজা খান নবাবের প্রশাসনের ফৌজদারি দিকটা তদারকি করতেন। যাহোক দেশীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার মান্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই নির্ভর করত ঔপনিবেশিকেরা কীভাবে এই প্রশাসন ব্যবস্থাকে বুঝত ও ব্যাখ্যা করত তার ওপরে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুঘল ব্যবস্থা কখনই কেন্দ্রগতভাবে সুসংবদ্ধ ছিল না। এই ব্যবস্থা অনেকখানি নির্ভর করত স্থানীয় ফৌজদারেদের বিচার বিভাগীয় প্রশাসনিক কার্য নির্বাহে বিবেচনা বা ইচ্ছাধীনতার ওপর। একথা ঠিক যে মামলা বিচারে বৈধতার উদ্দেশ্যে মুসলমান আইনের বা শরিয়ার উল্লেখ করা হত। তবে সেই মামলার গুরুত্ব এবং তা নিয়ে মুফ্‌তি ও কাজীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শরিয়া প্রয়োগে ব্যাপক পার্থক্য ঘটে যেত। এই ব্যবস্থায় জোরটা ছিল আপসে সমস্যার সমাধানের ওপরে, শাস্তিমূলক বিধান দেওয়ার ওপরে নয়। অবশ্য বিদ্রোহের মামলা ব্যতিরেকে। তবুও শাস্তি যদি দেওয়াও হত তবে তা অভিযুক্তের সামাজিক মান-মর্যাদা, অবস্থানের কথা ভেবেই দেওয়া হত। কোম্পানির অনেক কর্মচারীর কাছেই এই ব্যবস্থা অস্বাভাবিক রকমের শিথিল বলে মনে হয়েছিল। তারা এই ব্যবস্থাকে আঠারো শতকের অধঃপতনের লক্ষণ হিসেবেই দেখত। কারণ তখন জমিদারেরা এবং রাজস্বের ইজারাদারেরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্বকে জবরদখল করে নিয়েছিল। অভিযোগ ওঠে যে এইসব লোকেদের মনে বিচারের চেয়ে আর্থিক লাভের চিন্তাটাই বেশি থাকত। তাই বিচারব্যবস্থায় "বেআইনি টাকার নেশায় অসাধু লেনদেন" হত বলেও অভিযোগ ওঠে। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই কথা ওঠে যে জমিদার ও রাজস্বের ইজারাদারেদের হাত থেকে বিচারব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর সেই "বিচারব্যবস্থার বিশেষ অধিকার ও ক্ষমতাকে" কেন্দ্রীভূত করে কোনরকম লুকোচুরি না করেই সেখানে সরাসরি ইয়োরোপীয় তদারকির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ; এবং এইভাবেই কোম্পানির সার্বভৌমত্বকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা দরকার।[৮৬] কাজেই ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে শাসনকর্তা হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি বিচার ব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নেন। এই পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোনরকমই সন্দেহ ছিল না। কারণ তাঁর যুক্তি ছিল এই পদক্ষেপের মাধ্যমে "এই দেশের মানুষেরা কোম্পানির সার্বভৌমত্বে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে"।[৮৭] ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে রেজা খানকে আটক করে বিনা বিচারে প্রায় দুবছর

কারারুদ্ধ অবস্থায় রেখে দেওয়ার মস্ত বড় কারণ ছিল বিচারব্যবস্থা থেকে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সরানোর পথে সবথেকে শক্তিশালী প্রতিবন্ধকের হাত থেকে মুক্ত হওয়া। রেজা খানই একমাত্র মুঘল সার্বভৌমত্ব ও মুসলমান আইনের সর্বময় কর্তৃত্বের ওপর জোর দিয়ে আসছিলেন। এমনকী বেসুর খালাস পাওয়ার পরেও যাতে রেজা খানকে তার পূর্ব পদমর্যাদায় ফিরিয়ে নেওয়া না হয়, তার জন্য হেস্টিংস কোম্পানির নির্দেশকদের কাছে প্রার্থনা করেন।[৮৮]

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে নতুন বিচার ব্যবস্থা চালু হয়। প্রত্যেকটি জেলাতে দুটি করে আদালত স্থাপন করা হয়। একটি দেওয়ানি আদালত, অন্যটি ফৌজদারি আদালত। বোঝাই যাচ্ছে বিচার ব্যবস্থায় মুঘল পরিভাষা তখনও বজায় ছিল। এবং ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে মুসলমান আইন প্রয়োগ করার কথা হয়েছিল। আর বিয়ে, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয়ের আইনি মীমাংসার জন্য মুসলমান কিংবা হিন্দু আইন প্রয়োগ করার কথা ঠিক হয়েছিল। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই বিষয়গত বিভাগ অবশ্যই স্পষ্টতই ইংরেজ আইনব্যবস্থা অনুযায়ী করা হয়েছিল। ইংরেজ আইনব্যবস্থা অনুযায়ী বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সম্পত্তি, ধর্মীয় উপাসনা বা জাতিচ্যুতির মত বিষয়গুলিকে বিশপদের আদালতের এক্তিয়ারে রাখা হয়েছিল। সেসব আদালতে গির্জার আইন প্রয়োগ করা হত।[৮৯] ভারতবর্ষে বিভিন্ন জেলায় দেওয়ানি আদালতগুলিতে ইয়োরোপীয় প্রাদেশিক কালেক্টরেরাই পৌরোহিত্য করতেন। তাঁদেরকে দেশীয় আইন ব্যখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার কাজে সহায়তা করতেন মুসলমান মৌলবী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা। কলকাতায় থাকত একটি আপিল আদালত। সেখানে পৌরোহিত্য করতেন কাউন্সিলের সভাপতি এবং দুজন সদস্য। একজন কাজী ও একজন মুফতির তত্ত্বাবধানে থাকত ফৌজদারি আদালতগুলি। কিন্তু এসব আদালতগুলির চূড়ান্ত দেখভালের দায়িত্বে থাকতেন ইয়োরোপীয় কালেক্টরেরা। সদর নিজামত আদালত নামের আপিল আদালতটি মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে কলকাতায় আনা হয়। রেজা খানকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করা হয়েছিল। আপিল আদালতটির নিয়ন্ত্রণভার সভাপতি ও কাউন্সিল সদস্যদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবুও নবাবের সেই আইনগত সার্বভৌমত্বের কল্পকাহিনীকে জিইয়ে রাখা হয়েছিল। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তাদের সব আদেশনামাই চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত। বাস্তবে হেস্টিংস ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা তদারকি করতেন। শেষে অবশ্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে তার ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নেন। কোম্পানির নির্দেশকেরা নিজামত আদালতের প্রধান হিসেবে রেজা খানকে পুনরায় নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। অনিচ্ছা থাকলেও হেস্টিংস সেই সিদ্ধান্তকে মেনে নেন। আদালত আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে যায়।[৯০]

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থায় আবার কিছু পরিবর্তন ঘটে, অংশত রাজস্ব আদায়ের দাবির কারণে এবং অংশত

বিচারবিভাগীয় কাজকর্ম থেকে কার্যনির্বাহী প্রশাসনিক কাজকর্মগুলিকে আলাদা করা হচ্ছে নীতির বিরোধী হওয়ার কারণে। এ ব্যাপারে হেস্টিংস ও কলকাতা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি স্যার এলাইজা ইম্পে পরিকল্পনা করেন। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা কালেক্টরদের বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া হয়। দেওয়ানি মামলা বিচারের ক্ষেত্রে জেলা আদালতের পরিবর্তে প্রাদেশিক ছয়টি প্রাদেশিক আদালত স্থাপন করা হয়। পরে ওই ছয়টির জায়গায় আঠারোটি মফঃস্বল আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোম্পানির উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাই এইসব আদালতে পৌরোহিত্য করতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁদের "বিচারকের" পদমর্যাদা দেওয়া হত। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের নিয়ামক আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্ট কিছু দিনের জন্য আপিল আদালত হিসেবে কাজ করেছিল। এক্তিয়ারের সীমানার ব্যাখ্যা নিয়ে সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিতর্ক বাধে। পরিণামে সুপ্রিম কোর্টের কর্তৃত্ব কলকাতা শহরে এবং ফোর্ট উইলিয়ামের ওপর নির্ভরশীল ইংরেজ কুঠিগুলির বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসা করার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এই জায়গায় সদর দেওয়ানি আদালতকে এবারে পুনরায় গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য, আপিল আদালত হিসেবে এটি যাতে কাজ করতে পারে। স্যার এলাইজা নিজেই ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে এই আদালতের তত্ত্বাবধানের ভার নেন। এই সময়ে বিচার বিভাগীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে ইমপের নিয়মাবলীর ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। বিচার বিভাগের এইটি বেশ চোখে পড়ার মত একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি ধারার কথাও জানা যায়। সেই ধারাটি ছিল বিচারব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে সুসংবদ্ধ করে তোলার কথা। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে বিচার বিভাগীয় কিছু আচরণবিধি বেঁধে দেওয়া হয়। তাতে উপর থেকে নিচু তলা পর্যন্ত সমস্ত দেওয়ানি আদালতগুলিতে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন ও নিয়ন্ত্রণ মেনে চলার কথা বলা হয়েছিল। আরও বলা হয়েছিল যে, এবার থেকে বিচার বিভাগীয় সমস্ত আদেশ লিখিত আকারে দিতে হবে। বিচার ব্যবস্থায় নিশ্চয়তা ও সমতা আনার ক্ষেত্রে বেশ জোরালো সমস্যা ছিল। সমস্যাটি হল অসঙ্গতিপূর্ণ দেশীয় আইনগুলির রকমারি ব্যাখ্যা। যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কথাই ধরা যাক। কোন আইন প্রসঙ্গে তারা প্রায়ই ধর্মশাস্ত্রের নানা ঘরানার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিতেন। কখনও কখনও একই আইন নিয়ে তাঁদের মতামত এক এক মামলায় এক এক রকম হত। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে আইন প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ত। কাজেই হিন্দু আইনগুলির প্রয়োগগত অনিশ্চয়তার ভাব কমানোর উদ্দেশ্যে হেস্টিংসের হুকুমে এগারোজন পণ্ডিত মিলে সাজিয়ে গুছিয়ে বোঝার মতো ব্যাখ্যা করে হিন্দু আইনগুলির একটি সারসংক্ষেপ সংকলন করেন ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে। এন. বি. হ্যালহেড ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে সেই সংক্ষিপ্তসারটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। উদ্দেশ্য, আইনগত রায় দেওয়ার ব্যাপারে দেশীয় ব্যাখ্যাতাদের ওপরে ইয়োরোপীয় বিচারকদের নির্ভরতা কমানো।[৯১] ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলমান আইন

প্রয়োগের দিকে তাকিয়ে অনুরূপ একটি বিধিবদ্ধ সংকলন করা হয়। এইভাবে দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান আইনগুলিকে প্রয়োগের দিক থেকে একটি নির্দিষ্ট মানের উপযোগী করে তোলা হয়। এভাবে সেসব আইনগুলিকে প্রয়োগ করার মত পেশাগত দক্ষতার দরকার হয়ে পড়ে। সেই দক্ষতা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকেদের কাছ থেকেই আশা করা যেত। তারা ছিলেন "আইনজীবী"। হেস্টিংসের আমলের বিচার বিভাগীয় সংস্কারের আসল প্রবণতা ছিল "বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্বকে কেন্দ্রীভূত করা এবং প্রশাসনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা...।"[৯২]

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই অবস্থার কিছু বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটে। আবার কালেক্টরদের দেওয়ানি মামলা বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত লর্ড কর্নওয়ালিস তাঁর বিধিবদ্ধ আইন (১৭৯৩) অনুযায়ী দেওয়ানি বিচারের দায়-দায়িত্ব থেকে রাজস্ব আদায়ের দায়-দায়িত্বকে আলাদা করেন। উদ্দেশ্য, রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের এবং তাদের আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সম্পত্তির অধিকারকে নিরাপদ করা। নতুন ব্যবস্থায় গুরুত্ব অনুযায়ী নিচু থেকে উপরতলা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের আদালত ছিল। প্রথমে জেলা স্তরে আদালত ছিল। তারপরে ছিল শহরের আদালত। তারপরে ছিল চারটি প্রাদেশিক আদালত। তার ওপরে থাকত সদর দেওয়ানি আদালত। উচ্চতর এই আদালতে বিচারপ্রার্থী বিচারের আশায় আবেদন করতে পারত। সবকটি আদালতেই প্রধান হিসেবে ইয়োরোপীয় ন্যায়াধীশেরাই থাকতেন, তবে "এদেশীয় কমিশনারদের" নিয়োগের ব্যবস্থাও থাকত। ফৌজদারি মামলা বিচারের ব্যবস্থাটিকে ঢেলে সাজানো হয়। কারণ, জেলা শাসকেরা মুসলমান আইনগুলির অসঙ্গতি এবং ফৌজদারি আদালতগুলিতে দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম নিয়ে কর্নওয়ালিসের কানে অভিযোগ তোলেন। কিন্তু এর চেয়ে ঢের গুরুত্বপূর্ণ ছিল অন্য একটি বিষয়। বিচার বিভাগের মত প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব একজন ভারতীয়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া যে আর সম্ভব ছিল না, সেটি বেশ টের পাওয়া গিয়েছিল।[৯৩] এতদিন নায়েব নাজিম রেজা খানের তদারকিতেই ফৌজদারি আদালতগুলিতে কাজকর্ম চলত। সেইসব আদালতগুলিকে উঠিয়ে দেওয়া হল। তার পরিবর্তে ইয়োরোপীয় ন্যায়াধীশদের প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সদর আদালত। নায়েব নাজিমের কার্যালয়টিকে পর্যন্ত উঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপরে সদর নিজামত আদালতটি আবার কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। আদালতটি এবার গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের সরাসরি তদারকিতে কাজ করতে থাকে। এইসব ফৌজদারি আদালতের বিচার বিভাগীয় এক্তিয়ারে ব্রিটেনজাত প্রজাদের বিচার হত না। এদের বিচার হত কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারে। বস্তুত কর্নওয়ালিসের সমগ্র বিচার বিভাগীয় সংস্কার থেকে একটি জিনিস বেরিয়ে আসে তা হল বিচার বিভাগীয় গোটা ব্যবস্থাটি থেকে ভারতীয়দের পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে জাতিগত ও কর্তৃত্বের ঔদ্ধত্য প্রকাশে আর কোন অস্পষ্টতা ছিল না।

কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত এই সব নিয়ন্ত্রণ ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে বারাণসী অঞ্চলেও চালু হয়। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী টিপু সুলতানের নিকট থেকে যেসব এলাকা ইংরেজরা দখল করেছিল সেসব জায়গায় ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থা চালু হয়। আর অন্যান্য বিজিত অঞ্চলে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে সেসব নিয়ন্ত্রণ চালু হয়। বাংলাদেশে কর্নওয়ালিসের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই মাদ্রাজে সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে ইংরেজ কোম্পানিকে অসুবিধেয় পড়তে হয়। লর্ড ওয়েলেসলীর জোরাজুরিতেই সেখানে পরে এই ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের অধীনস্থ এলাকায় একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সেখানে কালেক্টরকে ভূ-বন্দন আধিকারিক (সেটেলমেন্ট অফিসার) হিসেবেও কাজ করতে হত। রাজস্বেরও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হত। বাংলাদেশের মত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী জমিদার শ্রেণীও সেখানে ছিল না। কাজেই রায়তওয়ারি এলাকায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার মধ্যে ভাগাভাগি করা রীতিমত মুশকিলের ব্যাপার ছিল। কিন্তু টমাস মানরো নাছোড়বান্দা হওয়ায় কোম্পানির নির্দেশকেরা শেষে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের জন্য একটি ভিন্নতর ব্যবস্থার প্রস্তাব দেন। সেই ব্যবস্থায় প্রশাসনের নিচু তলায় অনেক বেশি করে ভারতীয়দের নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রশাসনের নিচু তলা বলতে বোঝায় গ্রামের পঞ্চায়েত, জেলা ও শহরের আদালত। এর সঙ্গে প্রশাসনিক, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত এবং বিচার বিভাগীয় কিছু ক্ষমতা একসঙ্গে কালেক্টরের দপ্তরে নিহিত রাখা হয়েছিল। সেখান থেকেই এইসব কাজকর্ম পরিচালনা করা হত। এই ব্যবস্থা ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাদ্রাজে পুরোপুরি চালু হয়ে যায়। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এলফিনস্টোন এই ব্যবস্থাকে বোম্বাইতেও চালু করে দেন।

যাহোক বিচার বিভাগীয় কিছু নির্দিষ্ট বিষয় তখনও অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল। বিচার বিভাগীয় প্রশাসনে ভারতীয়দের নেওয়া ছাড়াও আরও একটি বিষয় ছিল। তা হল আইনগুলির বিধিবদ্ধকরণ। আইনগুলি বিধিবদ্ধ হলে সারা ব্রিটিশ ভারতে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বকে সমানভাবে কায়েম করা যাবে।

গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকাল এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট পাশ হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত বিচার বিভাগীয় প্রশাসনিক বিষয়গুলি তোলা হয়নি। সবার আগে চার্টার অ্যাক্ট বিচার বিভাগীয় পদগুলিতে প্রবেশের পথ ভারতীয়দের কাছে খুলে দিয়েছিল। এবং আইনগুলিকে বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি আইন আয়োগ (কমিশন) প্রতিষ্ঠারও ব্যবস্থা হয়। ইতিমধ্যে কালেক্টররা আবার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ফিরে পান। লর্ড মেকলের নেতৃত্বে নিযুক্ত আইন আয়োগ ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আইনগুলি বিধিবদ্ধকরণের

কাজ শেষ করে ফেলে। ফলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পরবর্তীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে চালু হয় দেওয়ানি কার্যবিধি (কোড অব্ সিভিল প্রসিডিওর)। ভারতীয় দণ্ডবিধি চালু হয় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। আর ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে চালু হয় ফৌজদারি কার্যবিধি (ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড)। এই প্রসঙ্গে রাধিকা সিংহের বক্তব্যটি খেয়াল করা যাক। তিনি বলেন যে, এইসব কার্যবিধি প্রয়োগ করে "ব্যবহার শাস্ত্রের (জুরিসপ্রুডেন্স) সর্বজনীন নীতিগুলি" প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। "একটি অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব এবং একটি সমান বিমূর্ত ও সর্বজনীন প্রজার ওপর তার অধিকারের ধারণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ব্যবহার শাস্ত্রের ওইসব সর্বজনীন নীতিগুলি।"[১৪] এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগত বিচার ব্যবস্থা কেবলমাত্র ব্রিটিশ ভারতীয় এলাকাতেই প্রযুক্ত হওয়ার কথা ছিল। বাকি যেসব এলাকা রাজপুরুষদের অধীনে ছিল, সেগুলির আকার ও প্রশাসনিক দক্ষতাগত পার্থক্য থাকত। সেসব জায়গায় ব্রিটিশ ভারতীয় আইনের সঙ্গে রাজপুরুষদের ব্যক্তিগত হুকুম বা ডিক্রি মিলিয়ে এক পাঁচমিশেলি আইন দিয়ে সাধারণত বিচার বিভাগীয় প্রশাসন চালানো হত। সর্বোচ্চ আপিল বিচারের কর্তৃত্বের লাগামও আবার ওইসব রাজপুরুষদের হাতেই থাকত। তবে রাজপুরুষদের দরবারে ইংরেজদের যেসব রেসিডেন্ট ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা থাকতেন, তাঁরা সবসময়ই রাজপুরুষদের ওপর খবরদারি চালাতেন। এই বিষয়ে আরও বেশি কিছু জানতে হলে দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর আলোচনা লক্ষ করতে হবে।[১৫]

তবে মুঘল আমলে ভারতে যেরকম বিচার ব্যবস্থা ছিল, তার চেয়ে ব্রিটিশ আমলে ভারতে বিচার ব্যবস্থা অনেক পাল্টে গিয়েছিল, যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণও হয়েছিল। তবে যেসব বিচার বিভাগীয় পরিবর্তন ব্রিটিশ আমলে ঘটেছিল, সেগুলি সাধারণমানের, ভারতীয়দের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন হয়েছিল।[১৬] কেননা আগে একাধিক রকমের বিচার বিভাগীয় কার্যবিধির সঙ্গে সাধারণ ভারতীয়দের পরিচয় ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে তারা একটি নিপুণতর বিচার ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। প্রথমদিকে অবশ্য ব্যক্তিগত বিষয় মীমাংসার জন্য পরম্পরাগত হিন্দু ও মুসলমান আইন প্রয়োগ করা হত। তবে সেসব আইনের বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা প্রায়ই আইনগুলিকে এদেশীয়দের কাছে দুর্বোধ্য করে তুলত। এদেশীয়দের কাছে মনে হত এ যেন ভিন্নতর কোন আইন। বিচার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। বাহ্যত শুধুমাত্র জেলা আদালতগুলির ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেই নয়, নতুন শ্রেণীর আইনজীবীদের প্রাধান্যে বিচার বিভাগীয় জটিল কার্যবিধিগুলি এদেশের সাধারণ মানুষেরা মানসিক দিক থেকেও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারত না। ফলে বিচার খরচবহুল হয়ে ওঠে। আদালতে বহু মামলা অমীমাংসিত অবস্থায় জমা পড়ে থাকে। ফলে অধিকাংশ লোকের পক্ষে বিচারপ্রাপ্তিতে অত্যাধিক দেরি হয়ে যেত।

"কখনও কখনও বিচার পেতে পঞ্চাশ বছরও লেগে যেত"। কিন্তু ধারাবাহিকতাও কিছু ছিল, বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যেভাবে হিন্দু ব্যক্তিগত আইন ব্যাখ্যা করতেন, তাতে ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল এবং সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরাই লাভবান হত। অন্যদিকে ছিল সাধারণ আইন যেখানে সামাজিক মর্যাদার শৃঙ্খল থেকে ব্যক্তি মানুষের মুক্তির ধারণাটিকে তুলে ধরা হত।[৯৭] কিন্তু তাতেও সমস্যা ছিল। এদেশীয়দের সভ্যতাগত হীনাবস্থা অথবা এদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত সংস্কৃতির অজুহাত দেখিয়ে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থায় বিশেষ বিবেচনা প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রাখা হত। আইনের চোখে সমতার ধারণা প্রায়শই ইয়োরোপীয়দের ক্ষেত্রে খাটত না। দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থায় আইনি সমতা যদিবা কিছুটা ছিল ফৌজদারি আদালতে ছিল শাসকের জন্য জাতিগত নানারকম সুযোগ-সুবিধা।[৯৮] আরও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কর্মক্ষেত্র ছিল। যেমন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কাজকর্ম। 'আইনের শাসনে'র ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যার প্রভাব কখনই এই দুটি ক্ষেত্রে পড়েনি।

পুলিশ

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি অধিকার করে। তখন মুঘল পুলিশ ব্যবস্থা ফৌজদারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাদের দায়িত্বে থাকত সরকার বা গ্রামীণ জেলা। কোতোয়ালেরা থাকতেন শহরগুলির দেখভালের দায়িত্বে। গ্রামের চৌকিদারদের নিয়ন্ত্রণ করতেন জমিদারেরা। তাঁরাই চৌকিদারদের বেতন দিতেন। তখন রেজা খান মহম্মদ রেজা খানের তদারকিতে এই ব্যবস্থা কিছুদিন চলেছিল। নায়েব নাজিম হিসেবে মুর্শিদাবাদে কাজ করতেন। কিন্তু সেই পুরোনো পদ্ধতিতে খুব একটা ফললাভ করা যেত না। যেহেতু কোম্পানির ক্ষমতা দিনে দিনে বেড়ে গিয়েছিল আর ততই কোম্পানি নবাবের কর্তৃত্বকে সবদিক থেকে খাটো করে দিয়েছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ঘটে দুর্ভিক্ষ। তারপর থেকে অপরাধের হার বেড়েই চলে। সাধারণ "আইন-শৃঙ্খলা" পরিস্থিতির দিনের পর দিন অবনতি ঘটতে থাকে। সম্পত্তি নিয়ে অপরাধের মাত্রা আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি অপরাধই ছিল সরাসরি কোম্পানির কর্মচারীদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আঘাত। কাজেই অন্যান্য বিভাগের মত কোম্পানির কর্মচারীদের স্বার্থেই পুলিশ বিভাগীয় প্রশাসনেও ইয়োরোপীয় তদারকির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফৌজদারি ব্যবস্থাই চলতে থাকে। তাতে সামান্য কিছু রদবদল ঘটানো হয়েছিল। শেষে ফৌজদারিদের সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের আনা হয়। জমিদারদের আরক্ষার কাজ তখনও বজায় ছিল। তবে এই কাজে জমিদারদের ইংরেজ শাসকদের অনুগত সহায়ক করে রাখা হয়।

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের এই সামান্য সংস্কারে সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি।

ভূস্বামীদের প্রতিশ্রুতি করেন দেওয়া হয়েছিল যে, তা জমিদারী সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। জমিদাররা এই ব্যবস্থার অপব্যবহার করতে থাকেন, অন্যদের এই ব্যবস্থার নিপীড়নের সুযোগ নিতে থাকেন। তাই ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব থেকে রেহাই দেন। পরিবর্তে তিনি জেলাগুলিকে এক একটি থানার অধীনে ভাগ করে দেন। কুড়ি থেকে তিরিশ বর্গমাইল পরিধির এলাকায় থাকত এক একটি থানার আওতা, কাজের এক্তিয়ার ও দায় দায়িত্ব। প্রত্যেকটি থানার দায়িত্বভার দেওয়া হয় একজন নতুন আধিকারিককে, তাকে বলা হত দারোগা। তাকে নিয়োগ ও তার কাজের দেখাশোনা করতেন ম্যাজিস্ট্রেটরা। যেসব প্রদেশগুলিতে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করেছিল, সেসব জায়গায় কোম্পানির পক্ষে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার নতুন উপায় ছিল এই দারোগা। স্থানীয় প্রতিনিধি এইসব দারোগাদের মধ্য দিয়ে "কোম্পানি বাহাদুরের কর্তৃত্ব ও শক্তি" প্রকাশ পেত।[৯৯] দারোগাদের সম্বন্ধে কৃষকদের সেরকমই ধারণা ছিল। পল্লীগ্রামে দারোগারা ছিল নতুন, বহিরাগত। স্থানীয় প্রভাবশালী ও ধনী ভূস্বামীদের এড়িয়ে চলা দারোগাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। যেসব শক্তিশালী জমিদারদের আইন বহির্ভূত অপরাধের ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। অধিকাংশই ক্ষেত্রেই দারোগারা সেসব জমিদারদের সঙ্গে সমঝোতা করে নিত। জমিদারদের সঙ্গে দারোগাদের সম্পর্ক উনিশ শতকের মধ্যেই বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে কিন্তু এ ছিল অভিশাপ। চলত উৎপাত, দমনপীড়ন আর জুলুমবাজি। কিন্তু অন্য দিকে পল্লীগ্রামে যখন এলাকা দখল করে ক্ষমতা কায়েম করার লড়াই লাগত, তখন তা হত ভয়ঙ্কর। কেননা সেই লড়াইয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জমিদার ও নীলকরেরা। উভয়পক্ষই ছিল সম্পদশালী এবং লাঠিয়ালদের শক্তিতে ভরপুর। অসহায় দর্শকদের মত দারোগারা দাঁড়িয়ে দেখত সে লড়াই। কারণ সেই ভয়ানক লড়াই ঠেকাবার মতো সাজসরঞ্জাম হতভাগ্য দারোগাদের প্রায় থাকত না বললেই চলে।[১০০] তাই ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে বারাণসীতেও যখন ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত করা হল, তখন জোনাথন ডানকান তাতে সামান্য কিছু রদবদল ঘটান। আরক্ষার দায়িত্বে থাকা তহশীলদারদের আরও বেশি করে ইংরেজ শাসকদের বশে রাখা হয়। জমিদারি এলাকার মধ্যে অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে জমিদারদের আরও বেশি করে দায়বদ্ধ করা হয়। দারোগা ব্যবস্থাকে মাদ্রাজে চালু করা হয় ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী টিপু সুলতানের কাছ থেকে পাওয়া এলাকাগুলিতে তহশীলদারি ব্যবস্থাকে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে চালু করা হয়। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে এই ব্যবস্থা ইংরেজদের বিজিত প্রদেশগুলিতেও চালু করা হয়। কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই এই তহশীলদারি ব্যবস্থার পরিণাম বড় ভয়ানক হয়েছিল। কারণ টমাস মানরো এই ব্যবস্থার অসুবিধার দিকগুলি ধরে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এই ব্যবস্থা "এদেশে প্রচলিত দেশাচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।"[১০১]

যখন যেখানেই কোন ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, ঔপনিবেশিক কর্তারা তার কারণ খুঁজে দেখেছেন। আর এদেশীয় অধস্তন আধিকারিকদের নৈতিকতার ও একাগ্রতার অভাবের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে। তাদের ঘাড়েই দোষ চাপানো হয়েছে। কাজেই কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত সেই ব্যবস্থাকে জঞ্জাল মনে করে বছর কয়েকের মধ্যে বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে তহশীলদারদের কাছ থেকে পুলিশ প্রসাশনের দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে দারোগা ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে উঠিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামে আরক্ষা ব্যবস্থার তদারকি করার দায়িত্ব দেওয়া হয় কালেক্টরকে। এরপর থেকে তিনিই একসঙ্গে রাজস্ব, আরক্ষা ও শাসন বিভাগীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। এসব ব্যাপারে তিনিই একমাত্র দায়বদ্ধ থাকতেন। বোঝাই যায় কালেক্টরদের হাতে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হল। এর ফলে আবার অন্য সমস্যাও দেখা দেয়। রাজস্ব বিভাগের অধস্তন কর্মীরাই রাজস্ব আদায়ের এবং গ্রামে গঞ্জে পুলিশি ব্যবস্থা তদারকি করার দায়িত্বে থাকত। তাদের মাধ্যমে চলত দমন-পীড়ন, জুলুমবাজি। যেমন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে নিযুক্ত মাদ্রাজ নিগ্রহ আয়োগের টরচার কমিশন প্রতিবেদনে দমনপীড়নের কথা প্রকাশ পেয়েছিল।[১০২] অন্যদিকে বাংলাদেশে আবার কালেক্টরের দফতরগুলিতে অধস্তন কর্মীর কোন সংস্থান ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে সেখানে পুলিশি কাজকর্ম করার জন্য দারোগাদের রেখে দেওয়া হয়েছিল। যদিও অবশ্য ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের পরে দারোগাদের অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণী শাসনব্যবস্থার অধীনে আনা হয়। সেই শাসনব্যবস্থাকে খুঁটিয়ে তদারকি করতেন জেলা শাসকেরা। কিন্তু এরকম জোড়াতালি দেওয়া বা ভাল-মন্দ মেশানো সংস্কার খুব একটা সন্তোষজনক ছিল না। কারণ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাষ্ট্রের দরকার ছিল একটি উপযুক্ত ও একনিয়মানুসারী পুলিশি ব্যবস্থার। তাহলে গোটা সাম্রাজ্যবাদী "আইনের শাসন" প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে, সম্পত্তি নিরাপদ হবে, এবং জোরদারভাবে কর্তৃত্ব প্রকাশিত হবে।

নতুন ধাঁচের এই পুলিশ ব্যবস্থার প্রথম পরীক্ষা হয় সিন্ধু অঞ্চলে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে স্যার চার্লস নাপিয়ের সিন্ধু অঞ্চল জয় করেন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটাতে এদেশীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর পুরোনো প্রচেষ্টাকে নাপিয়ের বাদ দিয়ে দেন। রাজকীয় আইরিশ পুলিশ বাহিনীর (রয়াল আইরিশ কনস্টাবুলারি) ধাঁচে তিনি আলাদা করে একটি পুলিশ দফতর খোলেন। দফতরের নিজস্ব আধিকারিক ছিল। এই পুলিশ ব্যবস্থাকেই নাপিয়ের এদেশে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির প্রথম উপযোগী বলে মনে করেন। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। পেশাদার পুলিশ বাহিনীর ধারণার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক মহলে ভাবাদর্শগত আপত্তি ছিল। আয়ারল্যান্ডে সম্প্রদায়গত এবং কৃষকদের আন্দোলন ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই ঘটনার কথা মাথায় রেখে সেখানেই প্রথম ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে একটি

নিয়মিত পুলিশ বাহিনী তৈরি করা হয়। উদ্দেশ্য, ওই বাহিনীর সাহায্যে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ঘটানো।[১০৩] এই ধাঁচের পুলিশি ব্যবস্থা সিন্ধু অঞ্চলে চালু করা হয়েছিল। এই রকম ব্যবস্থায় সমগ্র এলাকাকে একজন ইন্সপেক্টর-জেনারেল-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হত। প্রত্যেকটি জেলা থাকত একেকজন সুপারিনটেনডেন্ট অব্ পুলিশ-এর অধীনে। সুপারিনটেনডেন্ট আবার ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং জেলা কালেক্টরের কাছে নিজেদের কাজের জবাবদিহি করতেন। জেলা কালেক্টরদের হাতে থাকত অসামরিক প্রশাসনিক কর্তৃত্ব। পুলিশ বাহিনীর সাধারণ সেনারা ছিলেন ভারতীয়। তবে তাদের মাথার ওপর আধিকারিকেরা সব সময়ই হতেন ইয়োরোপীয়। সিন্ধু অঞ্চলের পুলিশি ব্যবস্থাকে যেভাবে সাজানো হয়েছিল, তাতে সেখানকার যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনকে কাবু করা যেত। অর্থাৎ সিন্ধু অঞ্চলের পরিস্থিতির সঙ্গে এই পুলিশি ব্যবস্থাটি বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। পরে এই ব্যবস্থা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে নব অধিকৃত পাঞ্জাবে চালু করা হয়। তারপর ব্যবস্থাটির মধ্যে বিভিন্ন রদবদল ঘটিয়ে বোম্বাইতে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে চালু করা হয়। মাদ্রাজে চালু করা হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। তবে মাদ্রাজের ব্যবস্থায় একটি সামরিক পুলিশবাহিনী ছিল। সেইসঙ্গে ছিল অসামরিক বাহিনীও। তবে তারা ছিল নিরস্ত্র। সামরিক পুলিশ বাহিনী ও নিরস্ত্র বাহিনী উভয়ই জেলার বেসামরিক শাসনকর্তা কালেক্টরের অধীনে থাকত। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে ব্রিটিশ শাসনের ভিত কেঁপে যায়। ইংরেজ কর্তারা বেশ নড়েচড়ে বসেন। তাঁরা টের পান যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধরে রাখার জন্য দরকার দক্ষ ও কার্যকর শাসন ও পুলিশ ব্যবস্থা যাতে প্রয়োজনীয় সংবাদ জোগাড় করা যায়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করা হয়। একটি পুলিশ প্রতিষ্ঠানের মূল কাঠামো রচনা করা হয়, ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের স্বার্থে। সেটিকে আইনানুগ করা হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় পুলিশ আইন। পুলিশ প্রতিষ্ঠানের সেই কাঠামোর মধ্যে সামান্য রদবদল করা হয়। তবে সেই কাঠামোটি ব্রিটিশ শাসনের পরবর্তী একশ বছর পর্যন্ত মূলত অপরিবর্তিতই থেকে যায়।[১০৪]

পরিবর্তিত নতুন পুলিশি ব্যবস্থায় সামরিক পুলিশবাহিনীকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। প্রদেশে প্রদেশে অসামরিক পুলিশবাহিনীকে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। অসামরিক পুলিশবাহিনী থাকত ইন্সপেক্টর-জেনারেলের অধীনে, যারা তাদের কাজের জবাবদিহি করতেন প্রাদেশিক সরকারের কাছে। জেলা সুপারিনটেনডেন্টরা তাঁদের কাজের জবাবদিহি করতেন কালেক্টরের কাছে। এইভাবে সমগ্র পুলিশ সংগঠনটিকে বেসামরিক কর্তাদের অধীনে রাখা হয় এবং অনেকদিন ধরেই ইন্সপেক্টর-জেনারেল পদগুলিতে সিভিল সার্ভেন্টস্‌দের নেওয়া হত। জেলা সুপারিনটেনডেন্টরা গ্রামের পুলিশ ব্যবস্থার দেখাশোনার দায়িত্বে থাকতেন। সাবইন্সপেক্টরের কাজ করতেন দারোগা। গ্রামের পুলিশি ব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করার যে সমস্যা অনেকদিন ধরে ছিল, তার সমাধান

উপরোক্ত পদ্ধতিতে করা হয়েছিল। এইভাবে পুলিশি ব্যবস্থায় উপরতলা থেকে নিচুতলা পর্যন্ত হুকুম জারির বিভিন্ন স্তর সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি হয়। আর ভারতীয়দের সুপরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ কমিশন পুলিশ বাহিনীতে আধিকারিকের পদে শিক্ষিত ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যবস্থা করে। কিন্তু "পদমর্যাদায় ইয়োরোপীয়রা যেখানে শুরু করতেন, ভারতীয়দের চাকরি জীবন শেষ হত সেখানে।"[১০৫] ভারতীয় পুলিশবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের লাগাম অসামরিক কর্তাদের হাতেই রাখা হয়েছিল। আর এই পুলিশবাহিনীতে অধস্তন ভারতীয় কর্মীদের ওপর কোন ভরসা ছিল না। এই হল ভারতীয় আরক্ষা ব্যবস্থা। এর ঔপনিবেশিক চরিত্রের প্রতিফলন স্বভাবতই বেশ জোরালো। প্রথাগত অর্থে ব্রিটিশ রাষ্ট্র কোন পুলিশি রাষ্ট্র ছিল না। তবে ডেভিড আর্নল্ড মনে করেন যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত এই সময়ে "একটি পুলিশ রাজ" ক্রমশ এদেশে গেড়ে বসে।[১০৬] বারে বারে কৃষক বিদ্রোহে আর রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলনে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাষ্ট্র একেবারে জেরবার হয়ে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতিকে ব্রিটিশ রাষ্ট্র তার সর্বপ্রধান হাতিয়ার পুলিশবাহিনী দিয়ে দমন করত বা আয়ত্তে আনত। দমন করার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী ছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্র। এর পরেও যদি পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেত, তবে তা সামাল দেবার জন্য সেনাবাহিনী ছিলই।

সেনাবাহিনী

ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্যের বিস্তার ও বিকাশের সম্পূরক হিসেবে জড়িত ছিল কোম্পানির সেনাবাহিনীর কলেবরে বেড়ে ওঠা। মাঝে মাঝেই কোম্পানিকে রাজকীয় বাহিনী, বিশেষ করে নৌবাহিনী ধার দেওয়া হত। উদ্দেশ্য, কোম্পানি যাতে ভারতে সংকট থেকে উদ্ধার পায়। কিন্তু এতে কিছু সমস্যা দেখা দেয় বিশেষ করে রাজকীয় বাহিনীর সেনানায়কদের সঙ্গে কোম্পানির অসামরিক কর্তাদের সম্পর্ক নিয়ে। তাই ভারতে একেবারে প্রথম থেকেই কোম্পানির স্থায়ী বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।[১০৭] উত্তর ভারতে সেনাবাহিনীতে কৃষক নিয়োগের প্রথা ষোল শতক থেকেই চলে আসছিল। একেই ডারক্ কল্ফ্ (১৯৯০ খ্রি:) বলেছেন, "সেনাবাহিনীর জন্য শ্রমের বাজার"। মুঘল আমলে কৃষকপ্রধান সেনাবাহিনী এবং অসামরিক প্রজাদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য করা হত না। আঠারো শতকে উত্তর ভারতে অযোধ্যার নবাব এবং বারাণসীর রাজার মত কিছু উত্তরসূরি রাজপুরুষেরা সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিষয়টির পরিশোধন করে নেন। অসামরিক প্রজাসাধারণের কাছ থেকে পরিশীলিত ও প্রশিক্ষিত কৃষকপ্রধান সেনাবাহিনীকে দূরে সরিয়ে রাখেন।[১০৮] এই পরম্পরাকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জুতসই মনে করেছিল। তাই কোম্পানি নিজের বাহিনী গঠন করার সময়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত পরম্পরাই

অনুসরণ করে। কোম্পানির এই বাহিনীই সিপাহী বাহিনী নামে পরিচিত হয়। ১৭২১–২৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিরাই প্রথম ভারতীয়দের নিয়ে বাহিনী গড়ে তোলার প্রথা চালু করেছিল। দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি (মেজর?) স্ট্রিঙ্গার লরেন্স ইংরেজ কোম্পানির জন্য ভারতীয়দের নিয়ে স্থায়ী বাহিনী গঠন করার অভিযান প্রথম শুরু করেন। লরেন্সই বাড়তি রাজকীয় নৌবাহিনী এদেশে এনেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল অবরুদ্ধ ইংরেজ কোম্পানিকে উদ্ধার করা। এটাই আবার লর্ড ক্লাইভ শুরু করেছিলেন ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাবের পরাজয়ের পরে। ইয়োরোপীয় সেনাবাহিনীর উৎকর্ষ অনুযায়ী ভারতীয় সিপাহী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে হত, সুশৃঙ্খল করতে হত। এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় সেনাপতিরাই ভারতীয় সিপাহীদের হুকুম দিত। প্রধান সেনাপতি বা হুকুমদাতা কমান্ডার-ইন-চিফ সহ এইসব আধিকারিকদের কেউ কেউ আবার ছিলেন রাজকর্মচারী। কিন্তু অধিকাংশ আধিকারিকদের কোম্পানির ডিরেক্টরেরা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে মনোনীত করতেন। উনিশ শতকের গোড়ায় আইন করে ভারতে বিশ হাজার রাজকীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখার কথা হয়। তাদের বেতনাদিও কোম্পানির দেওয়ার কথা হয়। উদ্দেশ্য, নেপোলিয়ন-উত্তরকালে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা খরচে ঘাটতি ভর্তুকি দিয়ে আপাতত পুষিয়ে দেওয়া।[১০৯] সেই সঙ্গে অবশ্য কোম্পানির ভারতীয় বাহিনীর আকার সমানে বেড়েই চলেছিল। বাংলার বাইরে কোম্পানির এলাকা-দখল যতই বাড়তে থাকে, ততই কোম্পানির সেনাবাহিনীর উপযোগী শ্রমের বাজারও বাড়তে থাকে। এই বাজার থেকেই কোম্পানি সেনা নিয়োগ করত। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির সিপাহীদের সংখ্যা ছিল ৮২,০০০। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে সেই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১,৫৪,০০০-এ। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সিপাহীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,১৪,০০০-এ।[১১০]

সীমা অলাভি বলছেন যে, "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল কোম্পানির সেনা নিয়োগ।[১১১] এই কারণেই কোম্পানির ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। ভারতে কোম্পানির খরচপাতির সবচেয়ে বেশিটাই হত সামরিক খাতে। সেই জন্যই খাজনা আদায় কার্যকরী করাও কোম্পানির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হত। রাজস্ব আদায় ও সামরিক বাহিনীর এই ওতপ্রোত যোগাযোগের ব্যবস্থাটিকেই ডগলাস পিয়র্স "মিলিটারি ফিসকালিসম্" বলে বর্ণনা করেছেন। সেনাবাহিনী শুধু এলাকাই দখল করত না, প্রকৃত বা কাল্পনিক অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকেও কোম্পানির সাম্রাজ্যকে রক্ষা করত। উচ্চমাত্রায় রাজস্ব ধার্যের বিরুদ্ধে কৃষকেরা বিদ্রোহ করত। সেনাবাহিনী সেইসব বিদ্রোহেরও মোকাবিলা করত। ভারতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে জোট বাঁধত। ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবরও এই সেনাবাহিনীই জোগাড় করত। কাজেই সেনাবাহিনীই ছিল ভারতে কোম্পানির প্রশাসনযন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সেনাবাহিনীর এই বিশেষ সংগঠনটিকে একেবারেই নাড়া দেন নি। ফলে কোম্পানির সেনাবাহিনী ছিল বেশ উচ্চবর্ণীয়। ১৮২০'র দশক থেকে যখন তাদের আর্থিক সুবিধা, সামাজিক বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছেঁটে দেওয়া শুরু হয়ে যায়, তখন তারা বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়ে দেয়। বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে কোম্পানির এলাকা পশ্চিমের জঙ্গল তরাই অঞ্চলে বিস্তৃত হয় ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণে টিপুর আমলে বিজিত এলাকাগুলিতেও কোম্পানির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এবারে কোম্পানির বাহিনীতে পাহাড়ী উপজাতীয় মানুষদের নিয়োগ করার চেষ্টা হয়। সমতল এলাকায় কোম্পানির স্থায়ী নিয়োগকেন্দ্র থাকত। কিন্তু পাহাড়ী এলাকায় নিয়োগের কাজ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মাধ্যমে করা হত। চাকরির মেয়াদকালে নিযুক্তদের মুঘল প্রথায় ঘাটওয়ালী জমির মাধ্যমে পারিশ্রমিক দেওয়া হত। ভারতীয় রাজশক্তিগুলি বিশেষ করে আঠারো শতকের শেষে মহীশূর রাজ্য এবং উনিশ শতকের গোড়ায় মারাঠারা পরাজিত হয়। এর ফলে এক বিরাট সংখ্যক সশস্ত্র সেনা উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে। সেসব উদ্বৃত্ত সেনাদের থেকে কোম্পানি নিজের বাহিনীতে সেনা নিয়োগ করতে পারত। কিন্তু ভারতীয় রাজপুরুষদের সেই ভেঙে যাওয়া সেনাদলের সবাইকে কোম্পানি নিজের বাহিনীতে নিতে পারেনি। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে সেনা নিয়োগ নিয়ে আরেকটি পরীক্ষা চালানো হয়। এবারে নেপালি, গাড়ওয়ালি ও শিরমৌরি পাহাড়ী মানুষদের মধ্য থেকে গুর্খা সেনাদের নিয়োগ করার চেষ্টা হয়। জন্মসূত্রে গুর্খারা নেপালি। এদেরকে ইয়োরোপীয় সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শৃঙ্খলা শেখানো হয়। এইভাবে এদেরকে এত দক্ষ করে তোলা হয় যে, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে এরাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।[১১৩]

এইভাবে কোম্পানির সাম্রাজ্যের সীমানা যত বাড়তে থাকে, ততই তার সেনাবাহিনীতে এদেশীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেরা স্থান পায়। সেনাবাহিনীর মধ্যে গড়ে ওঠে একাধিক সামরিক ঐতিহ্য। এগুলির মধ্যে সতর্কতার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে হত। সেই সঙ্গে আবার স্থানীয় প্রভাবশালী লোকেদের সঙ্গেও ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে হত। এরকম অবস্থায় বাংলার সেনাদল যেমন ছিল উচ্চবর্ণীয় চরিত্রের তেমনি বোম্বাই ও মাদ্রাজের সেনারা ছিল পাঁচমিশেলি। ১৮২০'র দশকে ভারতের অধিকাংশ রাজশক্তিগুলিই দুর্বল হয়ে পড়ে। কোম্পানির সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বেড়ে যায়। কিন্তু কোম্পানি অর্থসংকটে পড়ে। উপরোক্ত ভারসাম্যের খেলা খেলতে গিয়ে কোম্পানির ভেতরকার স্ববিরোধিতা বাইরে বেরিয়ে আসে। পরের দশকে কোম্পানির সেনা-প্রশাসনকে আরও সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল সিপাহীদের ও তাদের পরিবারগুলিকে আরও শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা। ১৮৩০-এর দশকের সংস্কারের লক্ষ্যই ছিল সেনাদের মধ্যে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে সকলকে সমান করা। সেনাদলের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য একটি সামরিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা। অলাভির বক্তব্য এইসব সংস্কার করতে গিয়ে

সিপাহীদের মধ্যে বিশেষ করে বাংলার সেনাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। কেননা একে তারা তাদের উচ্চবর্ণগত মর্যাদার অবমাননা বলে মনে করে। তাছাড়া স্থানীয় প্রভাবশালী লোকেদের সঙ্গে যে ক্ষমতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেই সম্পর্কগুলিও ওইসব সংস্কারের ঠেলায় লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ১৮৪০-এর দশকে তাই ভারতীয় বাহিনীর অসন্তোষ বিভিন্ন সময়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এইসব সন্তোষের ঘটনাগুলিই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সেনাবিভাগে বিদ্রোহের পরিস্থিতি তৈরি করে। এই বিষয়টি আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

বিদ্রোহ থেমে যাবার পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গঠন এবং সেখানে সেনা নিয়োগের কৌশল নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করা হয়। ভারতবর্ষের সামরিক বিষয় খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে পীল কমিশন বসানো হয়। এই কমিশনের সুপারিশে বলা হয় "এদেশীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন জাতির মানুষ থাকবে এবং সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটি বিভাগীয় দলে বিভিন্ন জাতের মানুষদের নিয়ে পাঁচমিশেলি করতে হবে।"[১১৪] তাই পরের বছরগুলিতে যেসব সেনাদলেরা বিদ্রোহ করেছিল, তাদেরকে বাতিল করা হয়। বিভিন্ন জাতের সেনাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সেনাদলে নিয়োগের ব্যাপারে পাঞ্জাবের ওপরে নজর রাখা হত। কেননা বিদ্রোহের সময়ে পাঞ্জাবের বাহিনীই ইংরেজদের অনুগত ছিল। উপরন্তু আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলিকে যেমন পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান, বোম্বাই ও মাদ্রাজ, সতর্কতার সঙ্গে আলাদা করে রাখা হয়। ১৮৮০'র দশকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগকৌশলকে নিপুণতর করে তোলা হয়। ভারতীয় জাতিসত্ত্বা সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক ধারণা এবং কুলগত বিশ্বাসকে কার্যক্ষেত্রে নিয়োগ করে "যুদ্ধোপযোগী জাত"-এর ধারণাটি গড়ে তোলা হয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকেদের যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, পাঞ্জাবের জাঠ, উত্তর ভারতের রাজপুত, অথবা নেপালের গুর্খাদের সেনা নিয়োগের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করে চিহ্নিত করা হয় তাদের রণোপযোগিতার ও কুলগত মর্যাদার কারণে। কুলগত মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে, তাদেরকে আর্য আমলের ক্ষত্রিয়কুলজাত মনে করা হত। এইসব সেনাদের নির্ভরযোগ্য যুদ্ধোপযোগী মনে করা হত। তবে বুদ্ধিমত্তার বিচারে তাদের ওপরে তত ভরসা ছিল না। তারা লড়াই করতে পারত। কিন্তু নেতৃত্ব দিতে পারত না। তাই হুকুমদানকারী ইয়োরোপীয় সেনানায়কেরা নিরাপদেই থাকতেন। ডেভিড ওমিসি হিসেব করে বলেছেন যে, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে "ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সেনাই পাঞ্জাব, নেপাল অথবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে এসেছিল।"[১১৫] এই সব সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রধানত কৃষকেরাই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল কারণ সেনাবাহিনীতে কর্মজীবন ছিল লোভনীয়। অন্যদিকে সামরিক প্রশাসনের স্বার্থে তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় ঐতিহ্যকে এবং সম্মানবোধকে প্রেরণা দিয়ে তাদের আনুগত্যকে সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। তারা

ভারতীয় আধিকারি...

শুরু হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের পরে ১৯৪০-এর দশকে ওই বিষয়টি নিয়ে পুরোমাত্রায় চিন্তাভাবনা করা হয়—দেরিতে হলেও জাতীয়তাবাদীদের দাবি কিছুটা মেনে নেবার উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা এত দেরিতে করা হয়েছিল যে, ভারতীয়দের সহানুভূতি ব্রিটিশ সরকার আর পায়নি। পরবর্তী বছরগুলিতে সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে নিয়োগের ধরন পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভারতীয় আধিকারিকদের অনেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।[১১৯] ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যে ফাটলের লক্ষণ খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ রাজ এদেশে তাদের ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটাতে বাধ্য হওয়ার পিছনে ওই ফাটলই ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। এসব নিয়ে আমরা শেষ অধ্যায়ে কথা বলব। তবে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে আরও বেশি করে আলোচনা করা আছে বর্তমান অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদে এবং অষ্টম অধ্যায়ে।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস

অসামরিক আমলাতন্ত্র এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে চালাত সেনাবাহিনীর সাহায্যে। সেনাবাহিনীকেও ওই আমলাতন্ত্র আর্থিক দিকে থেকে নিয়ন্ত্রণ করত। তবে এদেশে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের কোন এক্তিয়ার আমলাদের ছিল না। এদেশের প্রশাসনের উদ্দেশ্যে নীতি নির্ধারিত হত ব্রিটেনে। এদেশের আমলাতন্ত্র সেইসব নির্ধারিত নীতিগুলি প্রয়োগ করত মাত্র। তবে মনে রাখা দরকার লন্ডন ও ভারতের মধ্যে দূরত্বের কথা এবং যোগাযোগের অসুবিধার কথা। আবার অন্যদিকে এদেশে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ খবরাখবর পাওয়ার ব্যাপারে আমলাদের সুযোগ থাকত, দখল থাকত। সেসব ব্যাপারে যথেষ্ট বিবেচনা করার এবং পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগও তাদের থাকত। এই দিকটি ক্লাইভ ডিউই ভাল করে লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, "তাদের প্রতিপত্তির দিনে বিশ্বের মধ্যে না হলেও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তারাই ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী আধিকারিক।"[১২০] শুরুতে "এই আমলাতন্ত্র ছিল পৃষ্ঠপোষকতা ভিত্তিক"। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে নিয়োগ পদ্ধতির রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। সেই রূপরেখায় বলা হয়েছিল যে, একমাত্র কোম্পানির নির্দেশক সভার সদস্যদের মনোনয়নের মাধ্যমেই নিয়োগ করা হবে। নির্দেশকেরা এই মর্মে এক ঘোষণায় সই করে বলবেন যে, তাঁরা এই মনোনয়নের জন্য কোন টাকা পয়সা নেন নি। নানা কারণে নির্দেশকেরা তাঁদের পারিবারিক আত্মীয়-স্বজনদের বাইরের লোকজদেরও মনোনয়ন দিতে বাধ্য হতেন। তবুও দুর্নীতি ও অযোগ্যতা ক্রমেই কোম্পানির

প্রশাসনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতায় চরম অসমানতা ধরা পড়ে। বার্নার্ড কোন হিসেব কষে দেখিয়েছেন যে, ১৮৪০ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে "যেসব সিভিল সারভেন্ট ভারতবর্ষ শাসন করেছিল, তাদের একটা বড় অংশই ছিল পঞ্চাশ কি ষাটটি যৌথ পরিবারের সদস্য।[১২১] এই চাকরি থেকে ভারতীয়দের সতর্কতার সঙ্গেই বাদ দিয়ে রাখা হত। বছরে ৫০০ পাউন্ড বা তার বেশি বেতনের কোন পদেই ভারতীয়দের নিয়োগ করার নিয়ম ছিল না।

কোম্পানি সামাজ্যের সীমান্ত বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে প্রশাসনে দায়-দায়িত্ব। দরকার পড়ে ভারতীয় ভাষায় ও আইনে প্রশিক্ষিত, সুযোগ্য আমলাতন্ত্রের। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী ভারতে আসেন। তাঁর ছিল জাঁকজমকপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ। ১৮০০অব্দে তাঁর কার্যবিরণীতে তিনি লেখেন যে, ইংরেজের ভারতীয় সাম্রাজ্যকে "অস্থায়ী ও নিতান্ত অনিশ্চিত সাম্রাজ্য হিসেবে শাসন করা ঠিক হবে না"।[১২২] তিনি ইয়োরোপীয় প্রশাসকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে চেয়েছিলেন। এজন্য ওই বছরেই (অর্থাৎ ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে) কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সবকটি প্রেসিডেন্সি থেকেই সিভিল সার্ভেন্টরা এই মহাবিদ্যালয়ে (কলেজে) এসে তিন বছর ধরে প্রশিক্ষণ নিতেন নিজ নিজ কর্মস্থলে যাওয়ার আগে। কিন্তু মহাবিদ্যালয়টি বেশিদিন চলেনি। কারণ ওয়েলেসলী এই ব্যাপারে কোম্পানির নির্দেশকদের সমর্থন তাড়াতাড়িই হারিয়ে ফেলেন। কেননা নির্দেশকেরা ভয় পেয়ে যান যে এই প্রশিক্ষণ হয়তো বা ইয়োরোপীয় প্রশাসকদের লন্ডনের বদলে কলকাতার প্রতি অনুগত করে তুলবে। তাই ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে মহাবিদ্যালয়টি শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় হিসেবেই চলতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিবর্তে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের কাছে হার্টফোর্ডে ইন্ডিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্যালয়টিকে হাইলেবেরি অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌স্ মনোনীত সব প্রার্থীদেরকেই এই মহাবিদ্যালয়ে দুই বছরের প্রশিক্ষণ নিতে হত। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ধাপের পরীক্ষাতে পাশ করলে তবেই সেইসব প্রার্থীরা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পেত। তবে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় নিযুক্ত এইসব প্রশাসকদের আচরণকে উপরোক্ত শিক্ষা কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছিল, তা বলা কঠিন। কেননা লর্ড মেকলের সুপারিশ অনুযায়ী নানারকম সাধারণ বিদ্যা সংবলিত পাঠ্যক্রমের ওপর ভিত্তি করেই এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। সেই পাঠ্যক্রম থেকে ভাষার অংশটুকু বাদ দিলে, বাকি অংশের কোন প্রাসঙ্গিকতাই ছিল না ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে। কিন্তু হাইলেবেরি কলেজে পড়তে পড়তে ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে একটি সখ্যতার ভাব জেগে ওঠে। বস্তুত তারা নিজেদের একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীর সদস্য বলে মনে করতে থাকে।

যাহোক ১৮৩০-এর দশকের মধ্যে ভারতে আমলাদের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব

প্রচুর বেড়ে যায়, যেহেতু জেলা কালেক্টর আবার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নিজের কুক্ষিগত করেন। এমনকী কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও। নতুন বিজিত অঞ্চলে অনিয়ন্ত্রণ এলাকায়, যেমন পাঞ্জাব বা আসামে, জেলা কালেক্টরদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে কাজের নতুন নতুন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্তব্যও আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রশাসনে নৈর্ব্যক্তিকতাই বেশি প্রচলিত হয়। আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বিশদ উচ্চাবচের সৃষ্টি হয়। অনেক বেশি দক্ষ প্রশাসকের প্রয়োজন পড়ে। এই সময়ে একটা জিনিস বোঝা গিয়েছিল যে, শুধুমাত্র পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে প্রশাসনিক দায়দায়িত্বের গুরুভার বহন করার মত যোগ্য কর্মী পাওয়া যাবে না। দরকার ছিল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ইংল্যান্ডের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের প্রশাসনের কাজে টেনে আনা। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়। তবে সীমিত সংখ্যক প্রার্থীদের মধ্যেই এই পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। শুধুমাত্র নির্দেশকদের মনোনীত প্রার্থীরাই এই পরীক্ষায় বসতে পারত। এর ফলে পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটেনি। শেষে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন অনুযায়ী অবাধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এবার থেকে ভারতবর্ষের প্রশাসনের জন্য সিভিল সার্ভেন্টদের অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নেওয়ার রীতি চালু হল। "জন্মসূত্রে রানীর সাম্রাজ্যের সকল প্রজাই" এই পরীক্ষায় বসার অধিকার পেল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে হাইলেবেরি কলেজ উঠিয়ে দেওয়া হল। তখন থেকে সিভিল সার্ভিস কমিশন ইংল্যান্ডে একটি পরীক্ষা নিত। সেই পরীক্ষার মাধ্যমে সিভিল সার্ভেন্টদের নিয়োগ করা হত। এইভাবে কালে কালে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের ইস্পাত কাঠামোটি বেশ যথোপযুক্ত হয়ে উঠল, শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রয়োজন মেটাতে।

সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না যে এই ধরনের প্রশাসনিক কাঠামোয় ভারতীয়দের নেওয়া হলেও শুধুমাত্র অধস্তন পদেই নেওয়া হত। একে বলা হত আনকভেনান্টেড সিভিল সার্ভিস। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পরে ওয়ারেন হেস্টিংসের অধীনে কোম্পানির অধস্তন পদগুলিতে উত্তরোত্তর ভারতীয়দের নেওয়া হতে থাকে, বিশেষ করে বিচারব্যবস্থায়। পরে লর্ড বেন্টিঙ্ক প্রশাসনকে স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনে ভারতীয়দের নেওয়ার কথা বলেন; অপর কারণটি খরচ সংক্রান্ত হতে পারে। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে একটি রেগুলেশন চালু হয়, যার বলে ভারতীয় বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবুও কভেনান্টেড সিভিল সার্ভিসের ওপরের স্তরের পদগুলিতে ভারতীয়দের প্রবেশপথ বন্ধই ছিল। তবে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অবাধ হওয়ায় সেসব পদে প্রবেশের পথে ভারতীয়দের কাছে প্রকরণগতভাবে খুলে যায়। কিন্তু তবুও সেসব পদে ভারতীয়দের প্রবেশ কার্যকরীভাবে আটকেই রাখা হল। কারণ নিয়োগের

(কভেনান্টেড) ছিল না, তাদের অমর্যাদাকর অবস্থার অবসান ঘটে। এদের বলা হত প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস। বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস উঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রাদেশিক সার্ভিস থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন পদ পূরণ করা হত যেগুলি আগে শুধু আই. সি. এস. দের জন্য সংরক্ষিত থাকত। তখনও অবশ্য ভারতীয়রা লন্ডনে অনুষ্ঠিত অবাধ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে আই. সি. এস.-এ যোগ দিতে পারত। কিন্তু এই চাকরিতে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব একেবারে মাত্রাতিরিক্ত কম ছিল— ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৫ শতাংশ। তবে ওই বছর থেকেই প্রতিনিধিত্বের এই অনুপাতের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে।

জাতীয়তাবাদীদের দাবিতে শেষমেশ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আই. সি. এস. পদের জন্য ভারতে আলাদা করে নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইংল্যান্ডের সঙ্গে অবশ্য একযোগে নয়। আইনের এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এলাহাবাদে প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হয়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মনোহারিতায় মুগ্ধ হয়ে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইয়োরোপীয়দের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক ভারতীয় এই চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টাতে যদি "আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার।"[১২৪] প্রকাশ ঘটে থাকে (যখন সিভিল সার্ভেন্টদের ইচ্ছানুযায়ী সরকার চলত), তবে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে সেই স্বেচ্ছাচারী প্রবণতা কতকটা কমে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের পরে তা ঘটেছিল। তবে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের পরেও প্রশাসন কার্যত আমলারাই চালাতেন। যদিও তখন বিভিন্ন প্রদেশে ভারতীয় মন্ত্রীরা তাদের দপ্তরের কাজকর্ম তদারক করতেন। প্রশাসন প্রধানত আমলারাই চালাতেন কারণ সমাজের নিচু তলা পর্যন্ত সবকিছু তাদের নখদর্পণে থাকত এবং স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁদের ঘরোয়া মেলামেশা থাকত। ফলে এইসব আমলাদের বাদ দিয়ে মন্ত্রীরা প্রায় কিছুই করতে পারতেন না। যাহোক সিভিল সার্ভিসের আস্তে আস্তে ভারতীয়করণ করা হতে থাকে। ফলে সাম্রাজ্যের পক্ষে কর্তৃত্বপূর্ণ শাসনের উপায় হিসেবে এর মূল্যও কমে যেতে থাকে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ প্রশস্ত হয়। সিভিল সার্ভিসের এই ভারতীয়করণ চলতেই থাকে। সেই পরম্পরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও চলতে থাকে।[১২৫] এই সার্ভিসের নামটি শুধু পাল্টে যায়। হয়ে যায় ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস।

আবাসিক ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি (রেসিডেন্ট) ও সার্বভৌম ক্ষমতা (প্যারামাউন্টসি)

ইস্পাতের মত শক্তিশালী ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস যখন ব্রিটিশ ভারতকে শাসন করত। তখন ভারতীয় উপমহাদেশের পাঁচ ভাগের, দুভাগ অঞ্চলে কোম্পানির ও পরে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের 'পরোক্ষ শাসন' কায়েম ছিল। সেসব জায়গায় দেশীয়

রাজপুরুষদের নিয়ম কানুন খাটত। কিন্তু প্রশাসন চালাতেন আবাসিক ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এবং রাজনৈতিক এজেন্টরা। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্মের প্রকৃতি পাল্টে যায়। ব্যবসায়িক থেকে হয়ে যায় রাজনৈতিক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজপুরুষদের দরবারে কোম্পানির ব্যবসায়িক দালালেরা থাকত। তাদের কাজ ছিল কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ তদারকি করা। তারাও হয়ে ওঠে আবাসিক রাজপ্রতিনিধিদের মত। তারা ভারতীয় রাজপুরুষদের সঙ্গে কোম্পানি বাহাদুরের রাজনৈতিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ করত। রাজপরিবারে প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থাটি মাইকেল ফিশারের মতে[১২৬] একেবারেই নতুন ছিল। কারণ প্রচলিত ইয়োরোপীয় সামাজিক পরম্পরায় এরকম কোন ব্যবস্থার খোঁজ পাওয় যায় না। রাজপ্রতিনিধি রাখার এই ব্রিটিশ ব্যবস্থার সঙ্গে মুঘল আমলের ভকিল ব্যবস্থারও তফাৎ ছিল। মুঘল দরবারে ভকিলরা ছিল মুঘল অভিজাতশ্রেণীর এবং পোষ্য রাজপুরুষদের প্রতিনিধি। মুঘলদের উত্তরকালীন রাজপুরুষদের আমলেও এই একই ব্যবস্থা অবিকল বজায় ছিল। তবে ব্রিটিশ প্রতিনিধিত্বমূলক এই ব্যবস্থার পেছনে ছিল সার্বভৌমত্ব নিয়ে এক নতুন ভাবনা যাকে নতুন একটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতে থাকে। তা হল "প্যারামাউন্টসি"। ভারতীয় রাজশক্তিগুলি তাদের "নিজ নিজ এলাকার মধ্যে একাধিপতি ছিল"। কিন্তু তাদের সকলের ওপরে সর্বপ্রধান সার্বভৌম শক্তি হিসেবে ছিল কোম্পানি। রাজপুরুষদের মর্যাদা অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে ভারতীয় রাজশক্তিগুলির অধস্তন সার্বভৌমত্বের রূপ বদলাত। আবার যেসব পরিস্থিতিতে রাজপুরুষদের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তি হত, সেসব পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করেও রাজশক্তিগুলির সার্বভৌম ক্ষমতার রূপ বদলে যেত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে চিত্রটা ছিল অন্য। "ব্রিটিশ এসব 'সার্বভৌম' রাজপুরুষদের কার্যত পুতুলের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যায় অথবা তাদের ক্ষমতাকে তাদের নিজ নিজ রাজদরবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে"।[১২৭]

ভারতে কোম্পানি তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল এদেশের আর্থিক ও মানব সম্পদ হস্তগত করার জন্য। তাই কোম্পানি ভারতীয় রাজশক্তিগুলিকে সরাসরি শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত না। বরং পরোক্ষ শাসনে রাখাই পছন্দ করত। এই পছন্দের মূলে ছিল নানা কারণ। ব্রিটিশের সামরিক শক্তিকে টেক্কা দেওয়ার মতো ক্ষমতা যেসব রাজশক্তির ছিল না, তাদেরকে নিজ খুশি মত চলতো দেওয়া হয়েছিল। যেসব রাজশক্তি দূরে বা দুর্গম এলাকায় থাকত, তাদেরকে হিসেবের মধ্যে আনা হত না। আবার যেসব রাজশক্তির কোন আবাদী জমিই থাকত না এবং স্বাভাবিক কারণেই খাজনা প্রাপ্তির সম্ভবনাও থাকত সামান্য, সেসব রাজশক্তিকে জয় করার মত ইচ্ছা কোম্পানির খুব একটা থাকত না।[১২৮] নানা মতের চাপে ও টানে পড়ে কোম্পানি এই ধরনের নীতি নিয়েছিল। কখনো এদেশের ব্যাপারে হাতগুটিয়ে বসে থাকার জন্য কোম্পানির ওপরে রক্ষণশীলদের চাপ থাকত। কখনও এদেশের এলাকা সরাসরি অধিকার করে নেওয়ার জন্য থাকত আগ্রাসী

অজুহাতে। আবার কখনও বা সরাসরি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস্তবে প্রয়োগমুখী যুক্তি দেখানো হত। কাজেই রেসিডেন্সি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশে নানা ওঠা-নামা ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের আগের ভারতে কোম্পানির পরোক্ষ শাসনের ক্রমবিকাশে মাইকেল ফিশার পরিষ্কারভাবে তিনটি পর্যায় খুঁজে বার করেছেন। বক্সারের যুদ্ধের পরে (১৭৬৪ খ্রি:) কোম্পানি তার প্রতিনিধিদের মুর্শিদাবাদ, অযোধ্যা ও হায়দ্রাবাদের রাজদরবারে বসিয়ে দেয়। প্রথম পর্যায়ের (১৭৬৪ খ্রি:– ৯৭ খ্রি:) সেটা শুরু। ভারতে এগিয়ে যাওয়ার নীতি অনুসরণের ব্যাপারে কোম্পানির কর্তাদের তখনও পর্যন্ত কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না, সংশয়ও কাটেনি। কাজেই প্রথম পর্যায়ে রেসিডেন্সি প্রথার বিকাশ থেমে থেমে হয়েছিল এবং কোম্পানির প্রতিনিধিরাও তাদের কাজকর্মে বেশ সংযত, সাবধানী ও সতর্ক থাকতেন। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে কোম্পানির প্রতিনিধিরা একটু দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৭৯৮ খ্রি:–১৮৪০ খ্রি:) কিন্তু তাদের সেই দ্বিধা একেবারেই কেটে গিয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছিল এদেশে এলাকা দখলের উদ্দেশ্যে কোম্পানির আগ্রাসী উদ্যোগ। এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮–১৮০৫ খ্রি:) ও তাঁর অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি (এ ব্যাপারে বিশদ জানতে হলে দেখতে হবে ১.৩ অধ্যায়)। এই সময়ে কোম্পানির রেসিডেন্টদের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে। এদেশীয় রাজশক্তিগুলির সঙ্গে তাঁরা আর কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন না। পরোক্ষভাবে রাজশক্তিগুলির ওপর শাসন কায়েম করার চেষ্টা করতেন। অনেক ক্ষেত্রে রেসিডেন্টরা নিজেরাই কোম্পানির এলাকা দখলে মদত দিতেন। এই প্রবণতা সাময়িকভাবে থমকে যায়। কারণ ওয়েলেসলীকে ব্রিটেনে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং তাঁর জায়গায় আসেন লর্ড কর্নওয়ালিস। তাঁর সঙ্গে ছিল ব্রিটেনের কর্তাদের হুকুমনামা, এদেশের ব্যাপারে অনহস্তক্ষেপ নীতি অনুসরণের। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে কোম্পানির কর্মচারীরা আবার এদেশে এলাকা বিস্তারের উদ্দেশ্যে উঠে পড়ে লাগে। নতুন করে বিজিত অনেক এলাকাকেই কোম্পানির প্রতিনিধিদের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। কোম্পানির এই এলাকা বিস্তার ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অপ্রতিহতগতিতে চলতে থাকে। কোম্পানির আফগানিস্তান অভিযান (১৮৩৮–৪২ খ্রি:) অপরিণত ছিল। তাই সেখানে পরোক্ষ শাসন কায়েম করতে ইংরেজরা সর্বপ্রথম ব্যর্থ হয়। তৃতীয় পর্যায়ে (১৮৩৮–৪২ খ্রি:) তাই ক্ষমতাকে বিস্তৃত করার চাইতে "সংহত" করার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। ততদিনে এদেশের প্রাকৃতিক সীমা পর্যন্ত কোম্পানির প্রাধান্য বিস্তৃত হয়ে গেছে। তাই এই সময়ে কোম্পানির বিস্তার নীতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সে পরিবর্তনটি ছিল সরাসরি অধিকারের দিকে। অর্থাৎ লর্ড ডালহৌসি "স্বত্ব বিলোপ" নীতি প্রয়োগ করে অযোধ্যা, ঝাঁসি, নাগপুর, সাতারা এবং পাঞ্জাবের কয়েকটি এলাকা কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এইভাবে সরাসরি কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার